বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের পৈতৃক ভিটা

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ (৩রা চৈত্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) রাত ৮টায় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের বাইগার নদী তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪] তিনি শেখ বংশের গোড়াপত্তনকারী শেখ বোরহানউদ্দিনের বংশধর। তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার বা হিসাব সংরক্ষণকারী ছিলেন এবং তার মা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বড় বোনের নাম ফাতেমা বেগম, মেজ বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী এবং তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের

তার নানা শেখ আবদুল মজিদ তার নামকরণ করেন "শেখ মুজিবুর রহমান"। তার ছোটবেলার ডাকনাম ছিল "খোকা" ছোটবেলা থেকেই তিনি মানুষের প্রতি সহমর্মী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় নিজের গোলা থেকে ধান বিতরণ করতেন। সমিতি করে অন্যদের কাছ থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করে গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিলি করতেন।

শিক্ষা জীবন

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাত বছর বয়সে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ পাবলিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পিতার বদলিজনিত কারণে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাদারীপুর ইসলামিয়া বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেরিবেরি নামক জটিল রোগে আক্রান্ত হন এবং তার হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তার চোখে গ্লুকোমা ধরা পড়ে ও অস্ত্রোপচার করাতে হয় এবং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করতে বেশ সময় লেগেছিল। এ কারণে তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুস্থ হবার পর গোপালগঞ্জে মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময়ে তার গৃহশিক্ষক ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং বহু বছর জেল খাটা কাজী আবদুল হামিদ (হামিদ মাস্টার) নামীয় জনৈক ব্যক্তি। পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান নাম মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে আই.এ. এবং ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন তিনি বেকার হোস্টেলের ২৪ নং কক্ষে থাকতেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সম্মানার্থে ২৩ ও ২৪ নম্বর কক্ষকে একত্র করে “বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ” তৈরি করে। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি কক্ষটির সম্মুখে তার আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়। ভারত বিভাজনের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন। তবে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে উস্কানি দেয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বহিষ্কার করে। পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।

ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটেছিল ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকে। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটেছিল ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকে। ঐ বছরই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং খাদ্যমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে বাংলা প্রদেশ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। ঐ সময় বিদ্যালয়ের ছাদ সংস্কারের দাবি নিয়ে একটি দল তাদের কাছে যায়। দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিব।[২২] ব্যক্তিগত রেষারেষির জেরে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথমবারের মতো গ্রেফতার করা হয়। ৭ দিন হাজতবাস করার পর তিনি ছাড়া পান। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি এবং মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।[২০] ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। এ সময়ে তিনি এক বছর মেয়াদের জন্য নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।[২৬] ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ প্রমুখ যোগদান করেন। শেখ মুজিব এই সম্মেলনের অন্যতম আয়োজক ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যয়নকালীন তিনি বাংলার অগ্রণী মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। এম. ভাস্করণ তাকে "সোহ্‌রাওয়ার্দীর ছত্রতলে রাজনীতির উদীয়মান বরপুত্র" হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[২৭] একই বছর কলকাতায় ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক প্রমুখের নেতৃত্বে *হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ* আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ঐ সময় থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল–পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসরত ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে গঠিত "ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন

পাকিস্তান আন্দোলন, যুক্তবঙ্গ ও দেশভাগ

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নেমে পড়ে। মুসলিম লীগের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব এ সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।"পাকিস্তান দাবির পক্ষে গণভোট" খ্যাত ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিব বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে লীগের *ওয়ার্কার ইনচার্জের* দায়িত্বে থেকে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ কৃষক সমাজের কাছে গিয়ে তিনি পাকিস্তান দাবির ন্যায্যতার বিষয় প্রচার করে ভোট চান। এই নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে মুসলিম লীগ বিজয় লাভ করে। তবে একমাত্র বাংলায় তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের সময় কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন। ঐ সময় সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখের নেতৃত্বে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃত্বের বাইরে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের যে "যুক্তবঙ্গ আন্দোলন" সংগঠিত হয়, শেখ মুজিব তাতেও যুক্ত হন। পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি নিশ্চিত হলে আসাম প্রদেশের বাঙালি মুসলমান অধ্যুষিত সিলেট জেলার ভাগ্য নির্ধারণে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব সিলেটে গণভোটে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সংগঠক ও প্রচারক হিসেবে কাজ করেন। তিনি এসময় প্রায় ৫০০ কর্মী নিয়ে কলকাতা থেকে সিলেটে গিয়েছিলেন। গণভোটে জয়লাভ সত্ত্বেও করিমগঞ্জ পাকিস্তান অংশে না থাকা এবং দেশভাগের সীমানা নির্ধারণের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভৌগোলিক অপ্রাপ্তির বিষয় নিয়ে স্বীয় আত্মজীবনীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বাংলা ভাষা আন্দোলন

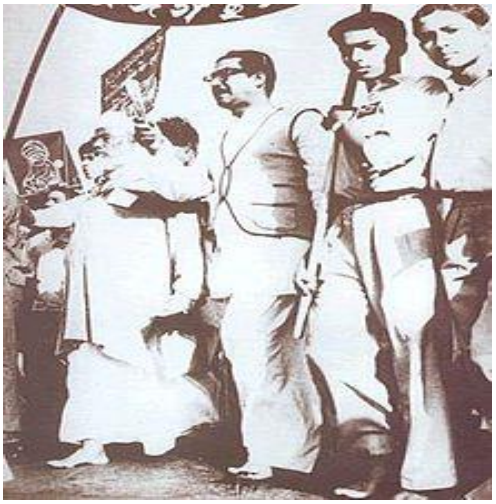

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তব্য দেয়ার প্রস্তাব নাকচ করেন পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেসের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। ঐ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলা ভাষার বিরোধিতা করলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা ও যুক্তফ্রন্ট সরকার

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান (মাঝে)

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে নবনির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করেন। আইয়ুব খানের সমালোচনা করার জন্য ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তাকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও, তার উপর নজরদারি করা হয়। ১৯৬০ ও ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কার্যত গৃহবন্দি হিসেবে থাকেন। এ সময় আইয়ুব খান ৬ বছরের জন্য সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। জেলে থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়। ১২ই সেপ্টেম্বরে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৪ মাস একটানা আটক থাকার পর তাকে মুক্তি দেয়া হলেও জেলের ফটক থেকে পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করার মাধ্যমে তিনি ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর জেল থেকে ছাড়া পান। জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। অন্যান্য সাধারণ ছাত্রনেতাকে নিয়ে গোপনে *নিউক্লিয়াস* ও *স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ* নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা। শেখ মুজিব ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি সামরিক সরকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান দলকে পুনরায় সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাকে আবার আটক করা হয়। ২রা জুন তারিখে চার বছরব্যাপী বহাল থাকা সামরিক আইন তুলে নেয়ার পর ১৮ই জুন তাকে মুক্তি দেয়া হয়।২৫শে জুন তিনি অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলে আইয়ুব খান আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়েন। ৫ই জুন তিনি পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে আইয়ুব খানের সমালোচনা করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি লাহোরে যান এবং সেখানে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে মিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এটি মূলত বিরোধী দলসমূহের একটি সাধারণ কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে প্রিয় শিষ্য শেখ মুজিব

পুরো অক্টোবর মাসজুড়ে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে মিলে যুক্তফ্রন্টের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন ও একই বছরের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে

পুনরায় সংহত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের মহাসচিব ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার মাধ্যমে মুজিব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেনাশাসক রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, রাজনীতির নামে মৌলিক গণতন্ত্র (*বেসিক ডেমোক্রেসি*) প্রচলন এবং পাকিস্তানের কাঠামোতে এক-ইউনিট পদ্ধতির বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন শেখ মুজিব।মৌলিক গণতন্ত্র অনুযায়ী সারা দেশ থেকে ৮০ হাজার প্রতিনিধি নির্বাচন করা হতো ও তাদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতেন। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং প্রদেশগুলোকে একত্রে জুড়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।ঐ সময় সামরিক বাহিনীর গণহত্যা আর বাঙালিদের ন্যায্য দাবী পূরণে সামরিক শাসকদের উদাসীনতা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে কাজ করতে গিয়ে মুজিব আইয়ুববিরোধী সর্বদলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন। নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে ভারতের দালাল অভিযুক্ত করে তাকে আটক করা হয়। শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং আপত্তিকর প্রস্তাব পেশের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য উচ্চ আদালতের এক রায়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তিনি মুক্তি পেয়ে যান।

ছয় দফা আন্দোলন

শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করছেন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে দুই বছর জেলে থাকার পর ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুপরিচিত। ৬ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই ষড়যন্ত্রকে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" নামে অভিহিত করে। এই অভিযোগে ১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। মামলায় পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১ ও ১৩১ ধারা অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছে।এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করা হয় এবং পাকিস্তান বিভক্তিকরণ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সকল আসামিকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ করে রাখা হয়।

১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুন ঢাকা সেনানিবাসের এক বিশেষ ট্রাইবুনালে এ মামলার শুনানি শুরু হয়।বিচারকার্য চলাকালীন ২৬ জন কৌশলী ছিলেন। শেখ মুজিবের প্রধান কৌশলী ছিলেন আব্দুস সালাম খান। একটি অধিবেশনের জন্য ব্রিটেন থেকে আসেন আইনজীবী টমাস উইলিয়ামস। তাকে সাহায্য করেন তরুণ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও মওদুদ আহমেদ। মামলাটিতে মোট ১০০টি অনুচ্ছেদ ছিল। ১১ জন রাজসাক্ষী ও ২২৭ জন সাক্ষীর তালিকা আদালতে পেশ করা হয়। মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের, এম আর খান ও মুকসুদুল হাকিম। এর অব্যবহিত পরেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। মামলাটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের জনসাধারণ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসেন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকার্য চলাকালীন ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগারো দফা দাবি পেশ করে, তন্মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। আন্দোলনটি এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। পরবর্তীকালে এই গণআন্দোলনই "ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান" নামে পরিচিতি পায়। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ , ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, কারফিউ, পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং বেশ কিছু হতাহতের ঘটনার পর আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করলে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকের পর এই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। একই সাথে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐ বছরেরই ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার অংশগ্রহণে আয়োজিত এই সম্মেলনে তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করেন। স্বীয় বক্তৃতায় শেখ মুজিব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির পক্ষে তার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে মুজিব তার ছয় দফাসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দাবিগুলো উপস্থাপন করেন। কিন্তু, তা প্রত্যাখ্যাত হলে সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসেন তিনি। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে "বাংলাদেশ" নামে নামকরণের ঘোষণা দেন। মুজিবের এই ঘোষণার ফলে সারাদেশে ব্যাপক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্মকর্তারা তাকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে মূল্যায়ন করতে শুরু করেন। মুজিবের বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা এনে দেয়। অনেক বুদ্ধিজীবীদের মতে, যে দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে, বাঙালিদের আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। বাঙালিদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত এই আত্মপরিচয় তাদেরকে একটি আলাদা জাতিসত্তা প্রদানে সাহায্য করে।তবে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

৭০-এর সাধারণ নির্বাচন

মূল নিবন্ধ: [পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭০]

৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রচারণায় শেখ মুজিব

গণঅভ্যুত্থানের বিরূপ প্রভাবে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন। তিনি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ভোলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং ১০ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। এতে জনগণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের দুর্বল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এটিকে 'স্থানীয় নেতাদের ব্যর্থতা' হিসেবে উল্লেখ করে। এসময় শেখ মুজিব বাস্তুহারাদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে থাকেন। ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য নির্বাচনের সময়সূচি পিছিয়ে দেয়া হয়। পরে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর (জাতীয়) ও ১৭ই ডিসেম্বর (প্রাদেশিক) "এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে" নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় জাতীয় পরিষদে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৬৯ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৪৪ জন প্রতিনিধি থাকতেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ২টি আসন ছাড়া বাকি সবগুলোতে জয়ী হওয়ায় জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে আওয়ামী লীগ। ১৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।

নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো, মুজিবের স্বায়ত্বশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ভুট্টো অধিবেশন বয়কট করার হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি ঐ সরকারকে মেনে নেবেন না। অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ও ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো শেখ মুজিবের আসন্ন প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের প্রবল বিরোধিতা করে। এসময় শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের কেউই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেননি, যদিও কিছুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবি করতে থাকে। জুলফিকার আলি ভুট্টো গৃহযুদ্ধের ভয়ে শেখ মুজিব ও তার ঘনিষ্ঠজনদেরকে নিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য একটি গোপন বার্তা পাঠান। পাকিস্তান পিপলস পার্টির মুবাশির হাসান শেখ মুজিবকে ভুট্টোর সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে প্ররোচনা দেন; যেখানে শেখ মুজিব হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টো থাকবেন রাষ্ট্রপতি। সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের অগোচরে সম্পূর্ণ গোপনে এই আলোচনা সভাটি পরিচালিত হয়। একইসময়ে, ভুট্টো আসন্ন সরকার গঠনকে বানচাল করার জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।

৭ই মার্চের ভাষণ

মূল নিবন্ধ: সাতই মার্চের ভাষণ

সাতই মার্চের ভাষণ দিচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সামরিক শাসকগোষ্ঠী দলটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোনভাবে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখা। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে ১লা মার্চ উক্ত অধিবেশনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বুঝতে পারে, মুজিবের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না।[৭১] এই সংবাদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে একযোগে হরতাল পালিত হয়। তিনি ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে সকল প্রকার দোষ তার উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালান। এ ধরনের ঘোলাটে পরিস্থিতিতেই ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বিপুলসংখ্যক লোক একত্রিত হয়। সাধারণ জনতা এবং সার্বিকভাবে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তার সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা দেন–

“রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।”

এর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার গণমাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেনাবাহিনীর চাপ থাকা সত্ত্বেও ইএমআই মেশিন ও টেলিভিশন ক্যামেরায় ভাষণের অডিও এবং ভিডিও চিত্র ধারণ করে রাখা হয়। ৮ই মার্চ জনতার চাপে ও পাকিস্তান রেডিও'র কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কারণে পাকিস্তান সরকার বেতারে এই ভাষণ পুনঃপ্রচারের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতার ঘোষণা

মূল নিবন্ধ: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

গ্রেফতারের পর করাচি বিমানবন্দরে দুইজন পুলিশ কর্মকর্তার সামনে উপবিষ্ট শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭১

ইয়াহিয়া খান ২৭ মার্চ পাকিস্তান রেডিওতে এক ঘোষণায় সামরিক আইন জারি করেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে মুজিব ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ:

“এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। জয় বাংলা।”

এর কিছুক্ষণ পর তিনি বাংলায় একটি ঘোষণা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন–

“সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোষ নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রু বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক লোকেদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।”

টেক্সাসে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নথি সংগ্রাহক মাহবুবুর রহমান জালাল বলেন, “বিভিন্ন সূত্র ও দলিল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এটিই প্রমাণিত হয় যে, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, যা ছিল তার বা অন্য কারো হয়ে ঘোষণা দেওয়ার অনেক পূর্বে।”

স্বাধীনতা ঘোষণার পরই রাত ১টা ৩০ মিনিটের সময় শেখ মুজিবকে সেনাবাহিনীর একটি দল তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ও সামরিক জিপে তুলে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।[১২৯][১৩০] ঐ রাতে তাকে আটক রাখা হয় আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে। পরদিন তাকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিমানে

করে করাচিতে প্রেরণ করা হয়। করাচি বিমানবন্দরে পেছনে দাঁড়ানো দুই পুলিশ কর্মকর্তার সামনের আসনে বসা অবস্থায় শেখ মুজিবের ছবি পরদিন প্রায় সব দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়। এর আগে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে শেখ মুজিবকে ক্ষমতালোলুপ দেশপ্রেমবর্জিত লোক আখ্যা দিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতির ওপর আঘাত হানা এবং ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগ তোলেন ও বলেন যে এই অপরাধের শাস্তি তাকে (শেখ মুজিবকে) পেতেই হবে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বন্দিজীবন

লাহোর থেকে ৮০ মাইল দূরে পাকিস্তানের উষ্ণতম শহর লায়ালপুরের (বর্তমান ফয়সালাবাদ) কারাগারে শেখ মুজিবকে কড়া নিরাপত্তায় আটকে রাখা হয়। তাকে নিঃসঙ্গ সেলে (সলিটারি কনফাইন্টমেন্ট) রাখা হয়েছিল। এদিকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমানে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাজউদ্দিন আহমেদ হন প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী বড় রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত করে। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত।

১৯শে জুলাই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সামরিক আদালতে মুজিবের আসন্ন বিচারের বার্তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করে। পাকিস্তানি জেনারেল রহিমুদ্দিন খান এই আদালতের নেতৃত্ব দেন। তবে মামলার প্রকৃত কার্যপ্রণালী ও রায় কখনোই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। লায়ালপুর কারাগারে সামরিক আদালত গঠন করা হয়। তাই মামলাটি “লায়ালপুর ট্রায়াল” হিসেবে অভিহিত। এই মামলার শুরুতে সরকারের দিক থেকে প্রবীণ সিন্ধি আইনজীবী এ. কে. ব্রোহিকে অভিযুক্তের পক্ষে মামলা পরিচালনায় নিয়োগ দেয়া হয়। আদালতের কার্যক্রমের শুরুতে ১২ দফা অভিযোগনামা পড়ে শোনানো হয়। অভিযোগের মধ্যে ছিল–রাষ্ট্রদ্রোহ, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। ছয়টি অপরাধের জন্য শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। আদালতে ইয়াহিয়া খানের ২৬শে মার্চ প্রদত্ত ভাষণের টেপ রেকর্ডিং বাজিয়ে শোনানো হয়। সেই বক্তব্য শোনার পর শেখ মুজিব আদালতের কোনো কার্যক্রমে অংশ নেওয়া এবং তার পক্ষে কৌঁসুলি নিয়োগে অস্বীকৃতি জানান। তিনি এই বিচারকে প্রহসন আখ্যা দেন। গোটা বিচারকালে তিনি কার্যত আদালতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিলেন। আদালত কক্ষে যা কিছু ঘটেছে, তা তিনি নিস্পৃহভাবে বরণ করেছিলেন। বিচার প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থন তো দূরের কথা, কোনো কার্যক্রমেই অংশ নেননি তিনি।

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি সামরিক বিমানঘাঁটি আক্রমণ করলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। পরদিন, ৪ঠা ডিসেম্বর সামরিক আদালত বিচারের রায় ঘোষণা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। আদালতের কার্যক্রম শেষে তাকে নেওয়া হয় মিয়ানওয়ালি শহরের আরেকটি কারাগারে। সেখানে দণ্ডাদেশ কার্যকর করার ব্যবস্থা চলতে থাকে। বলা হয়ে থাকে, যে কারাগার কক্ষে তিনি অবস্থান করেছিলেন, তার পাশে একটি কবরও খোঁড়া হয়েছিল। তবে দ্রুত পরিবর্তনশীল যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সরকার মুজিবকে ছেড়ে দিতে এবং তার সাথে সমঝোতা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধে ভারতের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গড়া যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ফিরে সরকার গঠন করেন।

কারামুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়বরণ করার ফলশ্রুতিতে ২০শে ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতাচ্যুত হলে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেন। ক্ষমতা হস্তান্তরকালেও ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দিতে অনুরোধ করেন।কিন্তু ভুট্টো নিজের স্বার্থ, বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের পরিণতি ও আন্তর্জাতিক চাপের কথা চিন্তা করে শেখ মুজিবের কোন ক্ষতি করতে চাননি। শেখ মুজিবের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে কারাগার থেকে দ্রুত নিরাপদ কোন স্থানে সরিয়ে ফেলতে চান এবং মিঁয়াওয়ালী কারাগারের প্রধান হাবিব আলীকে সেরূপ আদেশ দিয়ে জরুরি বার্তা প্রেরণ করেন। ২২শে ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানকে মিঁয়াওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং একটি অজ্ঞাত স্থানে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এরপর ২৬শে ডিসেম্বর সিহালার পুলিশ রেস্ট হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টো ঐদিন সেখানে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন। ডিসেম্বরের শেষের দিকে (২৯ অথবা ৩০ ডিসেম্বর) পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদের সাথে এবং ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে আবার ভুট্টোর সাথে মুজিবের বৈঠক হয়। ভুট্টো তাকে পশ্চিম পাকিস্তান ও নবগঠিত বাংলাদেশের সাথে ন্যূনতম কোন "লুস কানেকশন" রাখার অর্থাৎ শিথিল কনফেডারেশন গঠন করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেখ মুজিব ঢাকায় এসে জনগণের মতামত না জেনে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি ভুট্টো শেখ মুজিবের পাকিস্তান ত্যাগের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। সেদিন রাত ২টায় অর্থাৎ ৮ই জানুয়ারির প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান ও ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি কার্গো বিমান লন্ডনের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডি ছাড়ে। ভুট্টো নিজে বিমানবন্দরে এসে শেখ মুজিবকে বিদায় জানান। লন্ডনে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি লন্ডন থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর জনসমক্ষে ইন্দিরা গান্ধী ও "ভারতের জনগণ আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু" বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে এসে তিনি সেদিন প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের সামনে বক্তৃতা দেন।

বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে কালো অধ্যায় ``১৫ আগস্টের ১৯৭৫``

১৫ অগাস্ট ১৯৭৫: পিতাকে হত্যার কলঙ্কিত সেই ভোর

১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী ও উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে সপরিবারে নিহত হন। দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থান করায় সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে অন্ধকারতম দিন। বাঙালি জাতি এই দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে এবং সাথে সাথে স্মরণ করে বিশাল হৃদয়ের সেই মহাপ্রাণ মানুষটিকে যিনি তাঁর সাহস, শৌর্য, আদর্শের মধ্য দিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন বাঙালি জাতির অন্তরে।

Courtesy: mujib100.gov.bd

Courtesy: mujib100.gov.bd

Kiam Classic